প্রবন্ধ

এ প্রবন্ধে র‍্যাবকে বিভিন্ন দিক থেকে দেখার চেষ্টা হয়েছে। কোন প্রেক্ষিতে র‍্যাব সৃষ্টি হলো, সেটা যেমন এখানে তুলে ধরা হয়েছে, তেমনি থাকছে আমাদের বিচার বিভাগ ও ন্যায়বিচার বোধের ওপর র‍্যাবের কর্মকাণ্ডের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাবের বিশ্লেষণ। র‍্যাবের আইনগত বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কেও পাঠক এ লেখা থেকে ধারণা পাবেন বলে আশা রাখি। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর বর্তমান অবস্থার দিকেও এখানে স্বল্প পরিসরে আলোকপাত করা হয়েছে। এছাড়া থাকছে বর্তমান অস্থির আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট– উন্নত বিশ্বের উপর্যুপরি মানবাধিকার লঙ্ঘন, যার অজুহাত দিয়ে র‍্যাবের বিচার-বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডকে জায়েজ করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। সবশেষে পাবেন সন্ত্রাস দমনে সরকারি নীতি ও বাস্তবতার মধ্যে ফারাক প্রসঙ্গে লেখকের বিশ্লেষণ।

এ প্রবন্ধের লেখক এডভোকেট শাহ্ মোহাম্মদ মুশফিকুর রহমান আসক-এ কর্মরত আছেন।

র‍্যাব

সন্ত্রাস নির্মূল না রাষ্ট্রের সন্ত্রাস

শাহ্ মোহাম্মদ মুশফিকুর রহমান

“... পুলিশ একবার যে চারায় অল্পমাত্রও দাঁত বসাইয়াছে সে চারায় কোনো কালে ফুলও ফোটে না, ফলও ধরে না। উহার লালায় বিষ আছে। আমি একটি ছেলেকে নিজে জানি, তার যেমন বুদ্ধি তেমনি বিদ্যা, তেমনি চরিত্র। পুলিশের হাত হইতে সে বিক্ষত হইয়া বাহির হইল বটে, কিন্তু আজ সে তরুণ বয়সে উন্মাদ হইয়া বহরমপুর পাগলা গারদে জীবন কাটাইতেছে।”
–‘ছোট-বড়’, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবিবাবু পুলিশ-চরিত সম্বন্ধে বিলক্ষণ জানতেন বটে, কিন্তু নেহাত কপালগুণে তিনি পুলিশ আর সেনার সঙ্কর– র‍্যাপিড একশন ব্যাটালিয়নের সংস্পর্শে আসেননি। আসলে নির্ঘাত বুঝে যেতেন যে, আজকাল এই প্রজাতির হাতে পড়লে আর পাগলাগারদে থাকার ঝক্কি পোহাতে হয় না, ওয়ানওয়ে টিকেটে সরাসরি পরপারে চলে যাওয়া যায়।

তবে রবিঠাকুরের উদ্ধৃতিটি থেকে অন্তত এই আন্দাজ মেলে যে, ব্রিটিশরাজের পুলিশ আর হালের ‘নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারের’ পুলিশের মধ্যে গুণগত কোনো ফারাক ঘটেনি। উভয়েরই ধর্ম এক, কর্মও এক। এমনকি এটাতো প্রায়ই শোনা যায় যে, ব্রিটিশ আমলের পুলিশ যে থ্রি নট থ্রি রাইফেল ব্যবহার করতো, আমাদের এখনকার পুলিশও সেই একই অস্ত্র ব্যবহার করে। রেলব্যবস্থা, বিচারব্যবস্থা ইত্যাদি আর যে সকল ব্যবস্থায় আমরা ব্রিটিশদের ওপর পরিপূর্ণ আস্থা দেখিয়েছি তার একটা হচ্ছে পুলিশ ব্যবস্থা। ফলে এখানে সংস্কার কাজ তেমন হয়নি। পোশাক হয়তো বদলেছে, থ্রি নট থ্রি ছাড়াও কিছু নতুন অস্ত্র হয়তো যোগ হয়েছে, যোগ হয়েছে কুকুর বাহিনী; কিন্তু চরিত্রটি রয়ে গেছে সেই আগের মতোই। সাথে সীমাহীন দুর্নীতি যোগ হওয়ায় এই বাহিনী দিয়ে হয়তো বিরোধী দলের আন্দোলন কোনো রকমে সামাল দেয়া গেছে কিন্তু আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়নি। পরিণতিতে জনঅসন্তোষ যখন চরমে, বিরোধীদল যখন আইন-শৃঙ্খলাকে প্রায় আন্দোলনের একটা ইস্যু বানিয়েই ফেলতে যাচ্ছে, তখনই প্রয়োজন হয় বিশেষ ব্যবস্থার। মুক্তিদাতা হিসেবে চলে আসে সেনাবাহিনী, সাথে কিছু পুলিশ, আনসার, বিডিআর। যোগফল হচ্ছে র‍্যাপিড একশন ব্যাটালিয়ন বা র‍্যাব।

আইনের কথা

পাঠকের হয়তো স্মরণ আছে যে, ২০০২ সালের ১৭ অক্টোবর গভীর রাত থেকে শুরু হওয়া সেনা অভিযান নিয়ে সেই সময় বেশ জোর একটা আইনি বিতর্ক চলছিল। ‘অপারেশন ক্লিনহার্ট’ মোড়কে পরিচালিত অভিযানটি আদৌ আইনসঙ্গত কিনা, এর সাংবিধানিকতা আছে কিনা, থাকলে তার পরিসীমা কতটুকু ইত্যাদি নানা প্রশ্ন বিভিন্ন মহল থেকে উচ্চারিত হতে থাকে। চিরাচরিত নিয়মে সরকার এ ব্যাপারে নীরব ও একই সাথে নির্বিকার থেকে বুঝিয়ে দেয় যে, জবাবদিহিতা কেবল মুখে বলার বিষয়, চর্চার নয়। কিন্তু এখানেই বিষয়টা থেমে যায়নি। আইনজ্ঞরা ও সেনা বিশেষজ্ঞরা আইনি পুস্তক ঘেঁটে ঠিকই কিছু বের করেন, যেখানে বলা হয়েছে যে সিভিল প্রশাসনকে সাহায্য করতে সামরিক বাহিনী তলব করা যেতে পারে। অবশ্য পুলিশকে সাহায্য করার বদলে নিজেরাই আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় নেমে যাওয়া, আটক ব্যক্তিকে পেটানো এবং পরিণতিতে তার অকালমৃত্যু– সামরিক বাহিনীর ইত্যাদি দায়িত্ব সম্পর্কে কোনো কথা আইনি পুস্তকে বলা ছিল না। এসবের কারণে সেই সেনা অভিযানের আইনানুগতা নিয়ে শেষ পর্যন্ত ঠিকই প্রশ্ন থেকে গিয়েছিল। এর একটা স্পষ্ট ফল হচ্ছে, র‍্যাপিড একশন ব্যাটালিয়নের ক্ষেত্রে সরকার নিশ্চিতভাবেই সেই আইনি ঝামেলাটুকু রাখতে চায়নি। বেশ আটঘাট বেঁধে, সংসদে আইন পাস করিয়েই র‍্যাবের জন্ম দেয়া হয়। এ বাবদ যে আইনটিকে সংশোধন করতে হয়, তা হচ্ছে ১৯৭৯ সালের The Armed Police Battalions Ordinance। এই আইনে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর কাজ হচ্ছে পাঁচটি–

ক. অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষা
খ. বেআইনি অস্ত্র, গোলাবারুদ, বিস্ফোরক ইত্যাদি উদ্ধার
গ. সশস্ত্র অপরাধী চক্র কব্জা
ঘ. আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সাধারণ পুলিশ বাহিনীকে সহায়তা ও
ঙ. সরকার অর্পিত অন্য কোনো দায়িত্বপালন।

৯ জুলাই ২০০৩-এ প্রণীত সংশোধনীতে র‍্যাবকেও আর্মড পুলিশ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে এবং এই পাঁচটি দায়িত্ব তাদেরকেও পালন করতে হবে। সাথে র‍্যাবের জন্য বাড়তি হিসেবে যোগ হয়েছে আরও দুটি কাজ–

ক. অপরাধ ও অপরাধমূলক কার্যকলাপ বিষয়ে গোয়েন্দাগিরি
খ. সরকারের নির্দেশে কোনো অপরাধের তদন্ত পরিচালনা।

লক্ষণীয় যে, কেবল তদন্তের ক্ষেত্রেই র‍্যাবকে সরাসরি সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করতে হবে। এই বিশেষ বিষয়টাতে কারও কারও মধ্যে উদ্বেগ ও আশঙ্কার উদ্রেক হয়েছে। এ তালিকায় রয়েছেন আওয়ামী লীগ নেতা ড. মহিউদ্দীন খান আলমগীর। তার ভাষায়, “র‍্যাব কোন ক্ষেত্রে বা কার বিরুদ্ধে কী অপরাধের বিষয়ে তদন্ত করবে সে নির্দেশ সরকার দেবে অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে সরকারের তরফ হতে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বিশেষ তদন্ত ও কার্যক্রম প্রযুক্ত করার পরিধি [সুযোগ] রাখা হয়েছে। আইনের মোড়কে কতিপয় বিশেষ বা জঘন্য অপরাধ তদন্তের দায়িত্ব এদের দিলে এই ধরনের অশনি সম্ভাবনা থাকত না।” কথায় যুক্তি আছে; কিন্তু সরকারি নির্দেশের কথা উল্লেখ না থাকলেই তো আর র‍্যাবের কার্যক্রমের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে যেতো না, যেখানে আর্মড ব্যাটালিয়নের সার্বিক তত্ত্বাবধান সরকারের ওপর আইনগতভাবেই ন্যস্ত। সংশোধনী আইনে আরও বলা হয়েছে যে, কোনো অপরাধ তদন্তে র‍্যাব ফৌজদারি কার্যবিধি অনুসরণ করবে। এটি অভিযুক্ত ব্যক্তি এবং অভিযোগকৃত ঘটনার সাথে সম্পর্কযুক্ত অন্য সকলের জন্যই একটা আইনি রক্ষাকবচ। কেননা ফৌজদারি কার্যবিধিতে তদন্ত পরিচালনার যে নিয়মকানুন বর্ণনা করা আছে, তা অনুসরণ করে কাউকে অযথা ঝামেলায় ফেলা ততটা সহজ হওয়ার কথা নয়।

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে কেতাবী দিক থেকে র‍্যাব নিয়ে তেমন দুশ্চিন্তার কিছু নেই।

এবং বাস্তবতা

কিন্তু বাস্তবতা আইনের মতো এমন সোজাসাপ্টা আর নির্ভেজাল নয়। র‌্যাব তার জন্মের কিয়ৎসময়ের মধ্যেই বুঝিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে যে, আইনের ঘেরাটোপে আটকে থাকার চেয়ে বড় দায়িত্ব তাদের রয়েছে। সেই দায়িত্ববোধের ফলশ্রুতিতে খুব অল্প সময়েই পুলিশ লিটারেচারে 'ক্রসফায়ার' শব্দটা একটা ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে; ক্লিনহার্ট অপারেশনের সময় 'হার্ট এটাক' শব্দটা যেমন পেয়েছিল। তখন মনে হতো আমাদের দেশে হৃদরোগের প্রাদুর্ভাব যতখানি বলে ধারণা করা হয় পরিস্থিতি তার চেয়ে অনেক বেশি মারাত্মক অথবা যৌথ বাহিনীর গ্রেফতারকৃত প্রায় সকলেই কাকতালীয়ভাবে হৃদযন্ত্রের দুর্বলতায় আক্রান্ত। বর্তমানে র‌্যাবের আমলে 'ক্রসফায়ারে' মারা যাওয়ার মিছিল শুরু হয় পিচ্চি হান্নানকে দিয়ে। র‌্যাবের ভাষ্যমতে, হান্নানের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে তাকে সঙ্গে নিয়ে র‌্যাব সাভারে সন্ত্রাসীদের এক আস্তানায় হামলা চালায়। এ সময় সন্ত্রাসীরা পাল্টা গুলি ছোঁড়ে। এ সময় হান্নান পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে তার এক সময়ের সহযোগী সন্ত্রাসীদের গুলিতেই সে মৃত্যুবরণ করে। বর্ণনাটি আইনগত দিক থেকে নিষ্কলুষ করার জন্য র‌্যাব অবশ্য সাদা কাগজে নাসের শেখ ও আবু সাইদ নামে দুই স্থানীয় বাসিন্দার স্বাক্ষর নিয়ে গেছে। কিন্তু এলাকাবাসীর বরাতে ভোরের কাগজ জানায়, লাশের পাশ থেকেই পাঁচটি গুলির খোসা পাওয়া গেছে, যা খুব কাছ থেকে গুলি করার লক্ষণ। এছাড়া হান্নানকে করা চারটি গুলিই তার দেহ ভেদ করে চলে গেছে। দূর থেকে গুলি করলে যেটি হওয়ার কথা নয় (সূত্র– দৈনিক ভোরের কাগজ, ১০ আগস্ট ২০০৪)। এ ঘটনার পর থেকে ক্রসফায়ারে মৃতের সংখ্যা কেবল বাড়ছেই। কেন যে আসামিকে নিয়ে অস্ত্র উদ্ধার করতে গেলে প্রতিটি ক্ষেত্রেই তার সহযোগীরা র‌্যাবের ওপর গুলি ছুঁড়তে অস্ত্র বাগিয়ে ওত পেতে বসে থাকে, কেনই-বা সেই গোলাগুলির মধ্যে আসামিটির পালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা জাগ্রত হয়, আর প্রত্যেকবারই কেন গোলাগুলির এপক্ষ-ওপক্ষ কারও গায়েই গুলি না লেগে বেচারী পলায়নোন্মুখ আসামিটিই গুলি খেয়ে বেঘোরে প্রাণ বিসর্জন দিতে থাকে– বলা মুশকিল। দৃশ্যত মিল থাকলেও 'হার্ট এটাক' তত্ত্ব আর 'ক্রসফায়ার' তত্ত্বের মাঝে একটা গুণগত তফাত আছে। 'হার্ট এটাকে' মারা যাওয়া লোকগুলোকে যে অন্তত গুলি খেতে হয়নি, তা নিশ্চিত। তখন আমাদের অনেকেরই ব্যাখ্যা ছিল, সেনাবাহিনী তো আর পুলিশের মতো মানুষ পিটিয়ে আধা-খেঁচড়া অবস্থায় রেখে দেয়ার ট্রেনিং পায়নি, তাদের কাজ হচ্ছে শত্রুকে পুরোপুরি নিকেশ করে ফেলা। আর সেই কঠোর ট্রেনিংয়ের ফলই আমরা হাতেনাতে পেয়েছি। এই ব্যাখ্যার একটা গুরুত্বপূর্ণ অনুসিদ্ধান্ত হচ্ছে, মৃত্যুগুলো নির্যাতনের ফল হলেও সেগুলো অন্তত পরিকল্পিত বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ছিল না। কিন্তু র‌্যাবের ক্ষেত্রে সেটি বলা যাচ্ছে না। একটা উদাহরণ দিই। অস্ত্র উদ্ধারের নাম করে র‌্যাব মোল্লা শামীমকে নিয়ে মহাখালীর সাততলা বস্তি এলাকায় যায়। সেখানে কিছু গোলাগুলি হয় এবং র‌্যাব দাবি করে যে শামীমের সহযোগীদের সাথে গুলিবিনিময়ের সময় গুলিবিদ্ধ হয়ে শামীম মারা যায়। র‌্যাব উভয়পক্ষের মধ্যে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ বন্দুকযুদ্ধের কাহিনী বয়ান করলেও এলাকাবাসী পত্রিকাওয়ালাদের জানায় যে, ১০-১২ রাউন্ড গুলি হলেও সেটি হয়েছে একতরফা। এমন 'একতরফা ক্রসফায়ার' ঘটাতে ঠাণ্ডা মাথা লাগে, পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়। 'ক্রসফায়ার' ছাড়া র‌্যাবের অন্যান্য কীর্তির পেছনেও এমন পরিকল্পনার আঁচ করা যায়। এর মধ্যে সুমন আহম্মদ মজুমদারের ঘটনাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সুমন ছিল আহসানউল্লাহ মাস্টার এমপি হত্যাকাণ্ডের ১নং সাক্ষী। র‌্যাব সুমনকে ১৫ জুলাই বিকেল পৌনে চারটার দিকে তার বাসা থেকে ধরে নিয়ে যায়। এ সময় তারা কোনো ওয়ারেন্ট দেখায়নি। সেদিন দিবাগত রাত দেড়টার দিকে সুমন মারা যায়। সুস্থ-সবল দেহের যে তরুণটিকে র‌্যাব ধরে নিয়ে গেল তার শরীরে এতো আঘাতের চিহ্ন কোথা থেকে এলো, কীভাবে সে মৃত্যুবরণ করলো– তা বুঝতে কোনোই অসুবিধা হয় না। কিন্তু দৃশ্যত যেমনটা মনে হতে পারে, প্রকৃত ঘটনা তার চেয়েও মারাত্মক। থানার নথিতে সুমনকে যে মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়েছে, সেটি দায়ের করাই হয়েছে তাকে গ্রেফতারের প্রায় সাত ঘণ্টা পর ১৫ জুলাই রাত এগারোটায়। ঘটনা এখানেই শেষ নয়। র‌্যাবের দাবি হচ্ছে, সুমন চাঁদাবাজির দায়ে গণপিটুনির শিকার হয়েছে। কিন্তু যে স্থানে ঘটনাটি ঘটেছে বলে বলা হয়েছে তার আশপাশের লোকজন এমন চাঁদাবাজি বা গণপিটুনির কথা অস্বীকার করেছে। তবে এতটুকু বলেছে যে, পুলিশ একটি খামে দুটি ৫০০ টাকার নোট আর কিছু টাকা আকৃতির কাগজ দেখিয়ে সাদা কাগজে কয়েকজনের স্বাক্ষর নিয়ে গেছে। এই পুরো ঘটনা থেকে কি কিছু বোঝা যায়? কোনো বিশেষ পরিকল্পনা কি আঁচ করা সম্ভব? আমরা জানি না। তবে সুমনের পরিবার এ ঘটনার জন্য স্পষ্টভাবেই আহসানউল্লাহ মাস্টার হত্যাকাণ্ডের একজন আসামির ভাইকে দায়ী করেছেন। এটাই একমাত্র অভিযোগের ঘটনা নয়। পিচ্চি হান্নানের মেয়ে আইরিন সাংবাদিকদের কাছে অভিযোগ করেছে যে, একজন এমপির নির্দেশে তার বাবাকে মেরে ফেলা হয়েছে। আইরিন তো তবু তার ক্ষোভ প্রকাশ করতে পেরেছে, সেটিও জোটেনি লিটুর পরিবারের কপালে। খুলনায় র‌্যাবের হেফাজতে রহস্যজনকভাবে মৃত্যুবরণকারী লিটুর স্ত্রী ও ছোট ভাই একটি সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করেছিল। লিটু যে ভালো মানুষ ছিল, তা প্রমাণের তাগিদে নয়, বরং যেসব গডফাদার লিটুকে ব্যবহার করেছিল তাদের নাম-পরিচয় প্রকাশ করার জন্য। কিন্তু পুলিশ সাংবাদিক সম্মেলনের দিনে সারা দিন তাদের বাড়ি ঘেরাও করে রাখে এবং কাউকেই বাড়ির বাইরে যেতে দেয়নি (সূত্র: দ্য ডেইলি স্টার, ২ সেপ্টেম্বর ২০০৪)।

> *কেন যে আসামিকে নিয়ে অস্ত্র উদ্ধার করতে গেলে প্রতিটি ক্ষেত্রেই তার সহযোগীরা র‌্যাবের ওপর গুলি ছুঁড়তে অস্ত্র বাগিয়ে ওত পেতে বসে থাকে, কেনই-বা সেই গোলাগুলির মধ্যে আসামিটির পালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা জাগ্রত হয়, আর প্রত্যেকবারই কেন গোলাগুলির এপক্ষ-ওপক্ষ কারও গায়েই গুলি না লেগে বেচারী পলায়নোন্মুখ আসামিটিই গুলি খেয়ে বেঘোরে প্রাণ বিসর্জন দিতে থাকে– বলা মুশকিল।*

পপুলার জাস্টিস এবং আমাদের শঙ্কা

আমরা জেনেছি র‍্যাব হবে বাংলাদেশের এফবিআই। আমরা শুনেছি এই বাহিনীর ধারণা আমাদের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর মস্তিষ্কপ্রসূত। একথা আমাদের বলেছেন তৎকালীন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার আশরাফুল হুদা (সূত্র– দ্য ডেইলি স্টার, ৩০ জুন ২০০৪)। আমরা এও অবগত আছি যে, প্রতিমন্ত্রী এদের এলিট ফোর্স বলে ডাকেন, শীর্ষ সন্ত্রাসী ধরলে ঘোষিত এক লাখের বদলে দশ লাখ টাকা দেন। এ খবর পেয়ে আমরা 'স্বস্তি' পেয়েছি যে, হাজতে আটক শীর্ষ সন্ত্রাসীরা 'ক্রসফায়ার' আতঙ্কে হাজতখানাকেই নিরাপদ আশ্রয় মানছে, জামিন নিতে চাচ্ছে না। আমরা পত্রিকায় পড়ে আনন্দিত হয়েছি যে, চট্টগ্রামে আটক চোরাচালানের অত্যাধুনিক অস্ত্রগুলো বেকার ফেলে না রেখে র‍্যাবকে দিয়ে দেয়া হয়েছে। তবে দুঃখ পেয়েছি একথা জেনে যে, চট্টগ্রামেই র‍্যাবের আটক করা তিনশ' চোরাই মোবাইল সেট ব্যবহার করতে আদালত তাদের অনুমতি দেয়নি। এতো ভালো ভালো খবর জানাশোনার পরও আমরা এই ভেবে উদ্বিগ্ন যে, দেশে ক্রসফায়ারে মৃতের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে, মৃতের আত্মীয়রা সরকারি হুমকি-ধামকিতে ঘাবড়ে গিয়ে আইনের আশ্রয় নিতে পারছেন না, বিরোধী দল র‍্যাবের পেছনে সরকারের রাজনৈতিক স্বার্থের কথা বলছে এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি র‍্যাবের কল্যাণে আগের চাইতে আরও খারাপ হয়েছে; এমনকি নিজেদের মহান দায়িত্বের কথা ভুলে র‍্যাব নিজেই চুরি-ডাকাতির মতো ছিঁচকে কাজে জড়িয়ে পড়ছে। অভিযুক্ত যেই হোক, তার তো বিচার পাওয়ার অধিকারটা অন্তত আছে। র‍্যাব যদি বিচারের দায়িত্বটিও নিয়ে নেয় তবে তো আইন-আদালতের আর প্রয়োজন পড়বে না। এতে সরকারের কী ফায়দা হবে বলতে পারছি না, তবে ব্ল্যাক জাস্টিসের ধারণা সমাজে ভিত গাড়বে। এতে সাময়িক বিচারে কিছু লোকের সমর্থন থাকলেও এর পরিণতি হবে মারাত্মক রকম বিপর্যয়কর। একটু খোলাসা করি। *'ক্রসফায়ারে' সন্ত্রাসীদের মৃত্যু: আপনার প্রতিক্রিয়া কী?* এই রকম একটা প্রশ্নের উত্তর চেয়ে দৈনিক প্রথম আলো টেলিফোনে নাগরিকদের মন্তব্য সংগ্রহ করে, যা ২০০৪ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর ছাপা হয়। পিলে চমকে দেয়ার মতো সব মতামত আসে এ জরিপে। যে ৬৩ জনের মন্তব্য স্থান পেয়েছে, তার মধ্যে ৩০ জনই র‍্যাবের হাতে 'ক্রসফায়ারে' মৃত্যুকে বেশ জোরের সাথে সমর্থন করেছেন। আর যারা এর বিরোধিতা করেছেন তাদের অনেকেরই উদ্বেগের প্রধান হেতু কিন্তু পুলিশের হাতে আসামির মৃত্যু নয়, বরং তারা আফসোস করেছেন এই বলে যে, এ ধরনের হত্যাকাণ্ডের ফলে গডফাদারদের নাম অপ্রকাশ্যই থেকে যাচ্ছে। অর্থাৎ নীতিগতভাবে তারা 'ক্রসফায়ারে' মৃত্যুর বিরোধী নন। পুলিশের হাতে সন্ত্রাসীদের মৃত্যু কামনা করার এই প্রবণতার উৎস হচ্ছে দেশের আইন ও বিচার প্রক্রিয়ার প্রতি ক্রমবর্ধমান আস্থাহীনতা। এর আগেও নোয়াখালির চরাঞ্চলে সাধারণ চরবাসীর হাতে অর্ধ শতাধিক বনদস্যুর মৃত্যুর খবর আমরা পেয়েছি। সেই সাথে গণপিটুনিতে ডাকাত বা ছিনতাইকারীর মৃত্যুর ঘটনাতো নিত্যদিনকার ব্যাপার। পপুলার জাস্টিসের এই যে প্রতিহিংসাভিত্তিক ধারণা, তার হয়তো কিছু সামাজিক, এমনকি হয়তো কিছু নৈতিক ভিত্তিও রয়েছে। সাধারণ নিয়মে অপরাধী ধরে তাকে সাজা দেয়াটা রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব বলে আমরা মেনে নিয়েছি। এ দায়িত্ব পালনে কিছু হেরফের হওয়া বা ব্যতিক্রম ঘটা স্বাভাবিকতার বাইরে নয়। কিন্তু হেরফের হওয়াটাই যখন নিয়মে পরিণত হয়, অপরাধীরা যখন আইনের ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যায়, তখন বলতেই হয় যে, এ কাজে সরকার ব্যর্থ। আর যেহেতু সরকার জনগণের কাছে প্রতিশ্রুত কাজ পালনে অসমর্থ, সেহেতু বিকল্প প্রতিকারের কোনো সুযোগ এলে জনগণ তা কেন ছাড়বে বা তার বিরোধিতাই-বা কেন করতে যাবে? এমন একটা জাস্টিফিকেশনের মধ্য দিয়েই র‍্যাবের কীর্তি উল্লেখযোগ্য 'জনসমর্থন' পেয়েছে, যতোই তা হোক না ন্যায়বিচারের প্রচলিত ধারণার পরিপন্থী। কিন্তু ন্যায়বিচারের শর্তগুলোকেও তো অনেক তত্ত্ব ও বাস্তব পরীক্ষার মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা পেতে হয়েছে। সুতরাং তারও একটা মূল্য আছে। বিচারিক প্রক্রিয়াকে অস্বীকার করে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর হত্যাকাণ্ডকে আমরা যদি অনুমোদন করে নিই, সেক্ষেত্রে যখন এই অনুমোদনের অপব্যবহার হতে থাকবে তখন কি আমাদের পক্ষে ভিন্নতর কিছু বলার সুযোগ থাকবে? ধরা যাক, স্রেফ নামের ভুলে অথবা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থে আপনার নির্বিবাদী পরিবারের কেউ অথবা নিরীহ আপনিই র‍্যাবের 'ক্রসফায়ারের' কবলে পড়ে গেলেন, তখন কে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবে? আমরা কি মনে রাখছি যে, র‍্যাবের হাতে কেবল প্রতিষ্ঠিত শীর্ষ সন্ত্রাসীরাই খুন হয়নি, খুন হয়েছে সুমন মজুমদার, মোহাম্মদ আলীর মতো লোক। মোহাম্মদ আলী ছিলেন ৬০ বছরের এক দলিল লেখক। তার বাড়িতে সন্ত্রাসীরা ঢুকে পুলিশের ওপর গুলি চালায়। শুধু এ অপরাধে তাকে টেনে-হিঁচড়ে বাইরে এনে প্রকাশ্যে শরীরে বন্দুক ঠেকিয়ে ১২ রাউন্ড গুলি ছোঁড়া হয়। এই মর্মান্তিক ঘটনার পর মামলা না করার জন্য তার পরিবারকে হুমকি দেয়া হচ্ছে। র‍্যাবের অন্য হত্যাকাণ্ডকে মেনে নেয়া কি এই ধরনের হত্যাকাণ্ড ঘটানোর প্রশ্রয় দেয়া নয়? কে বলতে পারে যে আগামীকাল আপনি মোহাম্মদ আলীর পরিণতি বরণ করবেন না? র‍্যাবের 'সন্ত্রাসী' হনন আর আমাদের কারও কারও তা মেনে নেয়া কি পরিস্থিতির কোনো সমাধান এনে দিতে পারবে? নাকি র‍্যাবের এক্সট্রা জুডিশিয়াল কিলিং অনুমোদন পরিস্থিতিকে আরও ভয়াবহ পরিণতির দিকে নিয়ে যাবে?

আমরা যারা মানবাধিকার নিয়ে কাজ করি তাদের একটা বড় এজেন্ডা হচ্ছে পুলিশ হেফাজতে নির্যাতন ও মৃত্যুর বিরুদ্ধে ক্যাম্পেইনিং। সমাজে খুন, সহিংসতা ইত্যাদি বেড়ে গেলে আমরা উদ্বিগ্ন হই; কিন্তু পুলিশ হেফাজতে নির্যাতন ও হত্যার ঘটনায় আমরা হই বিচলিত। ছাগল যদি অধিক হারে চারাগাছ খেয়ে ফেলতে থাকে, তখন তা হয় বিপদ; কিন্তু বেড়া যখন চারাগাছ খাওয়া শুরু করে তখন সেটা আর বিপদ থাকে না, হয় বিপর্যয়। আমরা এখন সেই বিপর্যয়কালে আছি। উল্লেখ্য, পুরো ২০০৩ সালে পুলিশি নির্যাতনে মৃত্যু ঘটেছে মোট ৩৩ জনের। গেল বছরের প্রথম ছয় মাসে মারা গেছে আরও ২৩ জন। অপরদিকে ২০০৪-এর জুনের শেষভাগ থেকে প্রকৃত অপারেশনে যাওয়া র‍্যাবের হাতে ২০০৫-এর ১৬ মে পর্যন্ত মারা গেছে মোট ১১২ জন (অবশ্য এরমধ্যে শেষ চার মাসে র‍্যাবের 'ক্রসফায়ার' অনেকটাই কম ছিল)। আর যখন জানবেন যে সাধারণ পুলিশের বিশাল সংখ্যার বিপরীতে র‍্যাবের সদস্যসংখ্যা পাঁচ হাজারেরও কম, তখন আপনি আতঙ্কগ্রস্ত হতে বাধ্য। এর আগে ২০০২-এর ১৭ অক্টোবর থেকে শুরু হয়ে ২০০৩-এর ৯ জানুয়ারি পর্যন্ত তিন মাসেরও কম সময় ধরে চলা ক্লিনহার্ট অপারেশনে সেনা হেফাজতে মারা গিয়েছিল মোট ৫৬ জন। পুলিশের সাথে তাদের কার্যদক্ষতার তফাতটা স্পেশাল ফোর্সের সদস্যরা হাতেনাতে বুঝিয়ে দিয়েছে বটে। কিন্তু কম্পোজিট বাহিনীর এই দক্ষতা দেখে সাধারণ পুলিশ হাত গুটিয়ে বসে থাকবে কেন? তাই তারাও কাজে নেমে পড়েছে এবং এর ফল হচ্ছে 'ক্রসফায়ার' এখন পুলিশের

মেইনস্ট্রিম ভোকাবুলারিতে চলে এসেছে। তাই পরিসংখ্যান ঘেঁটে দেখা যাচ্ছে ২০০৪ সালের শেষে এসে শেষ ছয় মাসে যেখানে র‍্যাবের হাতে নিহতের সংখ্যা ৭৮, সেখানে সাধারণ পুলিশের হাতে বছর জুড়ে মারা গেছে ৯৯ জন। আবার ২০০৫-এর জানুয়ারি থেকে ১৬ মে পর্যন্ত র‍্যাব যেখানে মেরেছে ৩৪ জনকে, সেখানে পুলিশ মেরেছে মোট ১০৬ জনকে, যাদের প্রায় সবাই ছিলেন 'ক্রসফায়ারের' শিকার। প্রবৃদ্ধিটা বেশ স্পষ্ট। এতো কিছুর পরও কদিন পরপর কোবরা, চিতা, হাতি, গণ্ডার ইত্যাদি স্পেশাল ফোর্সের নাম শুনতে পাই। আমাদের ভবিষ্যৎ আসলেই তেমন সুবিধার নয়।

কেমন আছে হত্যাকাণ্ডের শিকার পরিবারগুলো?

কেউ যখন সন্ত্রাসের শিকার হয়, তখন ন্যায়বিচার চেয়ে সে রাষ্ট্রের দ্বারস্থ হয়। কিন্তু রাষ্ট্র নিজেই যখন সন্ত্রাস করতে শুরু করে তখন সে কার দ্বারস্থ হবে? আইন ও সালিশ কেন্দ্র থেকে তদন্ত দল গিয়েছিল র‍্যাবের হত্যাকাণ্ডের শিকার পরিবারগুলোর কাছে। তারা ভয়ে মুখ খুলতে চায়নি, মামলা-মোকদ্দমা তো দূরের ব্যাপার। এমনকি আমাদের অনুসন্ধানী দল তাদের সাথে কথা বলতে আসছে– এ খবর পাওয়া মাত্রই তারা ঘরে তালা মেরে অন্যত্র চলে গেছে– এমন উদাহরণও রয়েছে। আমরা খুব হতাশ হয়েছি, হতোদ্যম হয়েছি। কেননা যে আইনকে ন্যায়বিচারের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের ব্রত নিয়ে আমরা কাজ করি, তার আশ্রয় নিতেই লোকে দ্বিধান্বিত! বিচার না চাইলে ন্যায়বিচার তো আপনা থেকে আসবে না। কিন্তু ভেবে দেখুন তো অবৈধ অস্ত্রধারী এলাকার প্রভাবশালী মাস্তানদের অন্যায়ের বিরুদ্ধেই কি কেউ মামলা করতে যায়? সেখানে বৈধ অস্ত্রধারী এবং হত্যার লাইসেন্সপ্রাপ্ত খাস সরকারি হাইব্রিড বাহিনীর বিরুদ্ধে কথা বলবে এমন বুকের পাটা কার? আর এটা ভাবার কি কোনো কারণ আছে যে, র‍্যাবের সদস্যরা নিজেদের বিচার-বুদ্ধি খাটিয়ে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এসব হত্যাকাণ্ড ঘটাচ্ছে? না, তেমনটা ভাবার কোনো অবকাশ নেই। আমরা চোখের সামনে হয়তো র‍্যাবকে দেখতে পাচ্ছি; কিন্তু কলকাঠিওয়ালারা তো বসে আছেন আরও অনেক ওপরে। সেখানে বসেই তারা আইন নিয়ন্ত্রণ করেন, বিচার নিয়ন্ত্রণ করেন, আমাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেন। সেজন্যই আমরা দেখি যখন 'ক্লিনহার্টের' আইনগত দায় ক্লিন রাখতে দায়মুক্তি আইন পাস হয় তখন সেখানে যৌথ বাহিনীর সাথে সাথে তাদের নির্দেশদানকারী কর্তৃপক্ষকেও (যদিও উল্লেখ নেই যে সে কর্তৃপক্ষ কে) দায়মুক্ত করে রাখা হয়েছিল। অবশ্য না রাখলেও যে খুব ক্ষতি হয়ে যেতো তা হয়তো নয়। যে দেশে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতি বা এমনকি রাষ্ট্রপতি পর্যন্ত কারওই পদের নিশ্চয়তা নেই, সেখানে এসব 'নির্দেশদানকারী কর্তৃপক্ষের' বিরুদ্ধে অভিযোগের তদন্তই-বা কে করবে, আর বিচারের গুরুভারই-বা নেবে কে? থলের বিড়াল থলেতেই থেকে যাবে। তাই বিচার পাওয়ার প্রায় অলৌকিক আশা করাটা এসব হতভাগ্য পরিবারের জন্য দুর্ভাগ্যকে পুনরায় ডেকে আনার শামিল। এতোটা সইবার ক্ষমতা বোধ করি তাদের আর অবশিষ্ট নেই।

ত্বরিত বিচার ও বিচার বিভাগের ভারমুক্তি

র‍্যাবের 'সাফল্য' বা 'ব্যর্থতা' নিয়ে যতোটা আলোচনা হয়, তার খণ্ডাংশও হয় না এই বাহিনীর কর্মকাণ্ডের দীর্ঘমেয়াদি ফল নিয়ে। যেমন র‍্যাবের কাজের ফলে যে বিচার বিভাগ উত্তরোত্তর ভারমুক্ত হচ্ছে সে খেয়াল কি আমরা রাখছি? পরিস্থিতি যেভাবে এগোচ্ছে তাতে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, তাদের পৃথকীকরণ ইত্যাদি প্রাচীনপন্থী এবং ক্লিশে টাইপের কথাবার্তা বাদ দিয়ে আমাদের আরও বস্তুনিষ্ঠ এবং সময়োপযোগী সংস্কারের বিষয়ে মনোনিবেশ করতে হবে। একটু ভেঙে বলি। আপনারা হয়তো খেয়াল করেছেন যে আদালত, বিচার, শাস্তি ইত্যাদি বিষয়ে জোট সরকারের এক ধরনের তাড়াহুড়োর ধাত রয়েছে। দ্রুত বিচার আইন, দ্রুত বিচার ট্রাইবুনাল– এসব নামই বিচারব্যবস্থায় দ্রুততা আনয়নে সরকারের সদিচ্ছার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়! আইন বিজ্ঞানের প্রাচীনতম এক প্রবাদেও আছে– Justice delayed, justice denied. অর্থাৎ দেরিতে ন্যায়বিচার পাওয়া, অনেকটা না পাওয়ারই শামিল। এই প্রবাদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে আমাদের সংবিধানেও দ্রুত বিচার লাভের অধিকারের কথা বলা আছে (দেখুন ৩৫ অনুচ্ছেদের ৩য় দফা)। তবে এখানে বিচারপ্রার্থীর মুখ চেয়ে দ্রুততার বিধান রাখা হয়নি, বরং অভিযুক্ত ব্যক্তি যাতে অযথা হয়রানির শিকার না হয় সেজন্যই এই বিধান। অবশ্য এটা বলা যাবে না যে, আমাদের বর্তমান সরকারও একই ইচ্ছা মাথায় রেখে দ্রুত সব বিচারের কাজ সেরে ফেলতে চাইছে। বরং উল্লেখ করা একেকটি আইনের পেছনকার মতলব একেক রকম। যেমন– দ্রুত বিচার আইনে নির্দিষ্ট কিছু অপরাধের দ্রুত বিচারের কথা বলা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে যান চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা, শক্তি প্রদর্শন করা, সরকারি কর্মকর্তার দায়িত্ব পালনে বাধা সৃষ্টি করা, চাঁদা আদায় করা ইত্যাদি। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগবে, এর চেয়ে গুরু বা লঘুতর অপরাধগুলো কী অপরাধ করলো যে তাদের দ্রুত বিচার হবে না? উত্তরটা বেশ সোজা। আইনটিতে উল্লেখ করা অপরাধগুলোর আওতায় অতি সহজেই বিরোধীদলীয় কর্মী বাহিনীকে ফাঁসিয়ে দেয়া এবং অতঃপর শায়েস্তা করা সম্ভব। একই ধরনের আইন অবশ্য আমরা '৯১-এ 'গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা প্রত্যাবর্তনের' সময় থেকে বিএনপি, আওয়ামী লীগ– সব আমলেই দেখছি। অন্যদিকে দ্রুত বিচার ট্রাইবুনাল কোন অপরাধগুলোর বিচার করবে? যেগুলো সরকার আর আমলারা চাইবে সেগুলোর। যেমন দ্রুত বিচার ট্রাইবুনালে যেতে পারে এমন একটা ক্যাটাগরি হচ্ছে চাঞ্চল্যকর হত্যা মামলা। এখন স্বাভাবিকভাবেই দেশে প্রতি বছর যে কয়েক হাজার হত্যাকাণ্ড ঘটে, তার সবগুলোই তো আর

> *পুলিশের সাথে তাদের (র‍্যাবের) কার্যদক্ষতার তফাতটা স্পেশাল ফোর্সের সদস্যরা হাতেনাতে বুঝিয়ে দিয়েছে বটে। কিন্তু কম্পোজিট বাহিনীর এই দক্ষতা দেখে সাধারণ পুলিশ হাত গুটিয়ে বসে থাকবে কেন? তাই তারাও কাজে নেমে পড়েছে এবং এর ফল হচ্ছে 'ক্রসফায়ার' এখন পুলিশের মেইনস্ট্রিম ভোকাবুলারিতে চলে এসেছে।*

ততোটা চাঞ্চল্যপূর্ণ থাকে না, ফলে দ্রুত বিচারের অধিকারও সবার কপালে জোটে না। মিডিয়া একটু সদয় হলে, পুলিশ কর্মকর্তারা একটু নড়েচড়ে বসলে, সরকারের কিঞ্চিত নেকনজর থাকলে তবেই না কোনো হত্যাকে আপনি চাঞ্চল্যকর বলবেন। নয়তো কী করে আশা করবেন যে আপনি চাইলেই হত্যার দ্রুত বিচার পেয়ে যাবেন? তবে যতো যাই হোক, এটা স্বীকার করতেই হবে যে, Justice delayed, justice denied– এই প্রবাদটিতে সরকার অনেক অনেক গুরুত্ব দিয়েছে। কতো গুরুত্ব? এ প্রসঙ্গে আরেকটা প্রাচীন প্রবাদ বলি– Justice hurried, justice buried. অর্থাৎ ন্যায়বিচারে তাড়াহুড়ো করার অর্থ হচ্ছে ন্যায়বিচারের সমাধি দেয়া। এসব দ্রুত বিচারের আইন করে ন্যায়বিচারের সমাধি খোঁড়াটা মোটামুটি ভালোই সম্পন্ন হয়েছিল। কবর দেয়ার প্রক্রিয়াটা পূর্ণ হলো র‍্যাপিড একশন ব্যাটালিয়নের ত্বরিত একশনের মাধ্যমে। এখন আর এজাহার, চার্জশিট, চার্জ গঠন, বিচার পরিচালনা, সাক্ষ্য নেয়া, যুক্তিতর্ক শোনা, রায় লেখা, সেটি ঘোষণা, আপিল, রায় কার্যকর করা– ইত্যাকার অহেতুক ঝামেলার বালাই থাকছে না। 'সন্ত্রাসী' ধরে 'ক্রসফায়ারে' ফেলে দিলেই হলো। সরকারি প্রেসনোটটি তৈরি করাই আছে, সেখানে ব্যক্তির নাম বদলে তার আগে 'চিহ্নিত সন্ত্রাসী' শব্দযুগল বসাতে পারলেই কেউ আর কোনো প্রশ্ন করবে না। র‍্যাবের এমন ঝটপট বিচার প্রক্রিয়ায় আমাদের আদালত ব্যবস্থা এখন অনেকটাই ভারমুক্ত হয়ে পড়ছে। আগে কোন ঘটনাগুলোর দ্রুত বিচার হবে সেটা নির্বাহী বিভাগ ঠিক করতো, কিন্তু বিচারের দায়টা বিচার বিভাগের ওপরই ছিল। এখন সেই ঝামেলাটাও র‍্যাব নিয়ে নিয়েছে। আমরা এতোদিন মামলার জট কমাতে বিচার বিভাগের লোকবল আর দক্ষতা বৃদ্ধির কথা বলতাম। এখন বলতে হবে র‍্যাবের সম্প্রসারণ এবং আরও বেশি করে তাদের আর্মার্ড কার ও হেলিকপ্টারের মতো যুদ্ধাস্ত্র সরবরাহের কথা; যাতে করে দুর্ভেদ্য থেকে অতি নিরাপদে তারা 'ক্রসফায়ার দৃশ্য' মঞ্চায়ন করতে পারে।

১১ সেপ্টেম্বর এবং আমাদের র‍্যাব

দিনটিকে আমরা 9/11 নামে চিনি। আমাদের হিসাবে সেপ্টেম্বরের ১১ তারিখ বলতে 11/9 বলা উচিত হতো। কিন্তু আমেরিকানদের ঔচিত্যবোধ ভিন্ন ধরনের। তাদের মাসের হিসাব আগে, দিনের হিসাব পরে। তাদের নিয়মটাই আমরা আত্মস্থ করে নিয়ে 9/11বলাটা কণ্ঠস্থ করেছি। এই নেয়ার একটা প্রতীকী তাৎপর্য আছে, যা আমাদের আরেকবার স্মরণ করিয়ে দেয় মার্কিন মিডিয়া আমাদের অর্ধচেতন মনের কতোখানি জুড়ে দখল কায়েমে সক্ষম। সে যাই হোক, এই দিনটির পর পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতি এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তার প্রভাব নিয়ে লঘু-গুরু আলোচনা-সমালোচনা এখনো সরগরম। সেই ১১ সেপ্টেম্বরের পরে অন্য অনেক কিছুর সাথে সাথে রাষ্ট্রের নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধেও একটা বড় পরিবর্তন চলে এলো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে একটু একটু করে যেই 'ব্যক্তি অধিকার' প্রতিষ্ঠার লড়াই আমরা করে যাচ্ছিলাম, সেই 'ব্যক্তি অধিকার' বলি হলো 'রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা' রক্ষার অজুহাতে। মানুষের অধিকার চিহ্নিত হলো ক্ষুদ্রস্বার্থরূপে, আর বৃহৎ স্বার্থের মর্যাদা পেল রাষ্ট্রের নিরাপত্তা। আমেরিকা পাশ করলো প্যাট্রিয়ট অ্যাক্ট, আমরা বানালাম র‍্যাব। তারা বললো, "যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তার স্বার্থে যেকোনো কিছু করা বৈধ"; আর আমরা বললাম, "সন্ত্রাসীর আবার মানবাধিকার কী?" এই একই যুক্তিতে পৃথিবীর অনেক দেশই নতুন নতুন সন্ত্রাস বিরোধী আইন তৈরি করেছে অথবা পুরোনো আইনগুলোকে এই মহামারির সুযোগে ঝালাই করে নিয়েছে। ফলে অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি আচরণের যে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড পালনে বিশ্বসম্প্রদায় একদিন অঙ্গীকার করেছিল তা আর এখন মনে না রাখলেও চলে। তাই এখন সন্ত্রাসীদের বিনা বিচারে আটকে রাখা চলে, তাদের আইনজীবীর সাহায্য নিতে বাধা দিতে কোনো বাধা থাকে না, যথেচ্ছা পেটানো যায়, এমনকি গায়েবও করে দেয়া যায়। কেননা 'সন্ত্রাসবাদ' বিরোধী যুদ্ধে সবকিছুই জায়েজ। এই সুযোগে যদি 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' (মতান্তরে স্বাধীনতাকামী), ভিন্নমতাবলম্বী অথবা নিদেনপক্ষে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে একহাত দেখে নেয়া সম্ভব হয়– তাহলে মন্দ কি? কিন্তু যে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে এতোসব অনিয়ম, রাষ্ট্রের সেই নিরাপত্তা কি ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে? না, তা অবশ্য হয়নি। বরং চারদিকে বোমাবাজি আর গোলাগুলি লেগেই আছে, যদিও মিস্টার বুশ ইরাক যুদ্ধের আগে আমাদের 'সাদ্দামমুক্ত' এক নিরাপদ বিশ্বের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সাদ্দামের বোমা ছিল না, বোমা ছুঁড়ে মারার যন্ত্রও ছিল না। তবু মি. বুশের চোখে তিনি ছিলেন 'পৃথিবীর নিরাপত্তার পক্ষে সবচেয়ে বড় ঝুঁকি'। তাই তাকে নিউট্রালাইজ করাটাকে তিনি মিশন হিসেবে নিয়েছিলেন। বুশের সামর্থ্য আছে, তিনি তা পেরেছেন। অপরদিকে বুশের বোমা আছে, তা ব্যবহারের বিদ্যাটাও তার ভালোই জানা। তথাপি সরল বিবেচনায় আপনি যদি বুশকে পৃথিবীর নিরাপত্তার পক্ষে সবচেয়ে বড় ঝুঁকি মানেন এবং তারই থিওরি মেনে তাকে নিউট্রালইজ করার চিন্তা করেন, তবে তারচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ আর কিছু হবে না। বরং এরচেয়ে ঝুঁকিহীন কাজ হচ্ছে র‍্যাব তৈরি করা এবং উন্নত বিশ্বেও হামেশাই মানবাধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে– এই অজুহাত তোলা, যেমনটা আমাদের মাননীয় আইনমন্ত্রী প্রায়ই তুলে থাকেন।

নাইজেরিয়ান 'বাকাসি বয়েজ'-এর গল্প

অন্য অনেক দেশই যেমন যুক্তরাষ্ট্রের প্রীতিভাজন হয়ে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে বৃহত্তর 'ক্রুসেডে' শামিল হয়েছে, বাংলাদেশের র‍্যাবের ক্ষেত্রে বিষয়টা তেমন নয়। যদিও 'বাংলাভাই'দের 'জেহাদী' তৎপরতা এখানে অনেকদিন ধরেই চলছে। আমাদের র‍্যাব সেসব পিওর 'সন্ত্রাসী'দের নিয়ে ব্যস্ত যাদের টাকা বানানো, প্রতিপত্তি কামাই করা বা বড়জোর রাজনীতিবিদ হওয়া ছাড়া তেমন কোনো বৃহৎ লক্ষ্য নেই। কিন্তু সরকারি সন্ত্রাস দিয়ে কি বেসরকারি সন্ত্রাস দমন করা সম্ভব? সম্ভব হোক বা না হোক, সেই চেষ্টাটা কিন্তু অনেক দেশেই হয়েছে। যেমনটা হয়েছে নাইজেরিয়ায়। সংখ্যার দিক দিয়ে নাইজেরিয়ায় পুলিশের অভাব রয়েছে। তার ওপর সংঘবদ্ধ অপরাধীরা অস্ত্রশস্ত্রের দিক দিয়ে যতটা আধুনিক হচ্ছে, রাষ্ট্রীয় বাহিনী তার সাথে পাল্লা দিয়ে কুলাতে পারছিল না। তাই ১৯৯৯-এর পর থেকে বেসামরিক সরকারের আমলে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি মোটামুটি তাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হিসেবে দাঁড়িয়ে যায়। কিছুতেই যখন কিছু হচ্ছিল না, তখন সন্ত্রাস দমনের নামে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে বেসামরিক লোকদের নিয়ে গড়ে ওঠে সশস্ত্র গোষ্ঠী। এর মধ্যে সবচেয়ে 'খ্যাতি' অর্জন করা গ্রুপটির নাম হচ্ছে বাকাসি বয়েজ (Bakassi Boys)। এরা খুবই ভয়ঙ্কর। সন্দেহভাজনদের ধরে এনে পেটানো, মেরে ফেলা বা স্রেফ 'গায়েব' করে দেয়া এদের নিত্যদিনের কাজ। এই গ্রুপগুলোর ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা রহস্যজনক। তারা ভালো-মন্দ কিছুই বলে না, যদিও নাইজেরিয়ার সংবিধানমতে সামরিক বাহিনী ও পুলিশ বাহিনী ছাড়া অন্য সকল সশস্ত্র বাহিনী নিষিদ্ধ। তবে সংবিধানের তোয়াক্কা না করেই রাজ্য সরকারগুলো এই গ্রুপগুলোকে মদদ দেয়। অনেকটা আমাদের দেশে সরকারের বাংলাভাইকে না দেখার মতো। এমনকি কয়েকটি রাজ্যে আইন করেও তাদের বৈধতা দেয়া হয়েছে। সংখ্যাগত ও প্রতিপত্তিগত দিক দিয়ে তাদের শনৈ শনৈ বিস্তারে সাধারণ নাইজেরিয়ানদের প্রতিক্রিয়া ছিল বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

সন্ত্রাসের জ্বালায় অতিষ্ঠ লোকজন শুরুতে এদের বেশ সমর্থনই করছিল; কিন্তু এই 'জনসমর্থন' বেশি দিন আর একই রকম থাকেনি। নিয়মহীন প্রক্রিয়ায় নিয়ম ফিরিয়ে আনার ভুল পদ্ধতি সমর্থনের মাসুল তারা দিতে শুরু করলো অল্পদিনের মধ্যেই। কেননা অচিরেই এই গ্রুপগুলো চোর-ডাকাত ধরা বাদ দিয়ে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক আর গোষ্ঠীগত স্বার্থে ব্যবহৃত হতে লাগল। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ, অন্যায়ের প্রতিবাদকারী, ভিন্নমতাবলম্বী, ধর্মগুরু– কেউই নিস্তার পেল না। নির্বিচারে মারা গেল হাজার হাজার লোক, আর নির্যাতনের শিকার হলো অগণ্য মানুষ। এমনকি 'আবিয়া' রাজ্যের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা যখন পার্লামেন্টে বসে আলাপ-আলোচনা করছিলেন, তখন সেখানে গিয়ে তাদের ওপর হামলা চালায় বাকাসি বয়েজ। তাদের অপরাধ ছিল, আর্থিক অব্যবস্থাপনার কারণে ওই রাজ্যের গভর্নরের পদচ্যুতির বিষয়ে তারা বাতচিত করার ধৃষ্টতা দেখিয়েছিলেন।

সন্ত্রাসের রাজনীতি, রাজনীতির সন্ত্রাস

যে ক্রমাবনতিশীল আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির কথা বলে বিশেষ বাহিনীগুলো নামানো হয়, গত অনেক বছর ধরেই সেটি আমাদের প্রধান সমস্যা। রাজনীতিবিদেরা স্বীকার করুক বা না করুক সমস্যাটা সিস্টেমিক পর্যায়ে চলে গেছে এবং এতে প্রধান অবদান সন্ত্রাসের নয়, রাজনীতির। আমরা নিয়ম করে পাঁচ বছর অন্তর অন্তর ব্যালটে সিল-দেয়া-জাতীয় একটা বিষয় দেশের রাজনীতিতে প্রবর্তন করতে পারলেও এর মধ্যে কোনো গুণগত পরিবর্তন আনা সম্ভব হয়নি। ফলে রাজনীতি এখনো ক্ষমতার বিষয়। ক্ষমতার রাজনীতি ভালো রাজনীতিবিদ দাবি করে না, এমনকি জনপ্রিয় নেতাও না, বরং প্রয়োজন যেকোনো মূল্যে নির্বাচনে জয় ছিনিয়ে আনার মতো লোক। আর এমন শক্ত-পোক্ত নেতার প্রয়োজন শক্ত-পোক্ত কর্মীবাহিনী। তাই একালে এমন কোনো গডফাদার পাওয়া মুশকিল যিনি কিনা একই সাথে সক্রিয় এবং প্রথিতযশা রাজনীতিবিদও নন। বিগত সরকারের সময়ও আমরা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পদে আসীন আওয়ামী লীগার গডফাদার দেখেছি। এখন দেখছি জাতীয়তাবাদী গডফাদার। সন্ত্রাস আর দুর্নীতির সাথে রাজনীতির এই যে প্রায় অবিচ্ছেদ্য গাঁটছড়া, সেটার কোনো সুরাহা না করে আজ এই বাহিনী তো কাল ওই বাহিনী, পরশু কম্বিং অপারেশন তো তরশু বম্বিং অপারেশন– কোনো কিছু দিয়েই কোনো কাজ হবে না। ফলে পরিস্থিতি যখন চরমে পৌঁছে যাবে, তখন জনঅসন্তোষের ঢলে বাঁধ দিতে একটা-দুইটা পিচ্চি হান্নান ধরা হবে এবং মুখ ফুটে দু'একজন হোমরাচোমরা রাজনীতিকের নাম বেরোতে না বেরোতেই তারা ক্রসফায়ারের ফেরে পড়ে অকালে প্রাণ হারাবে।

শেষ কথা

আইন-শৃঙ্খলার সমস্যাটা একদিনে তৈরি হয়নি, সমাধানটাও একদিনে আসবে না। মাঝখানে কোনো জগাখিচুড়ি বাহিনী নামিয়ে কিছুদিনের জন্য হয়তো গুটিকয় 'শীর্ষ সন্ত্রাসী'কে ব্যতিব্যস্ত রাখা যাবে, সাময়িকভাবে কিছু বাহবাও হয়তো কুড়ানো সম্ভব, কিন্তু সমস্যাটি তার মূলসহ জায়গাতেই থেকে যাবে, পেছনে রেখে যাবে রাষ্ট্রের হাতে অসংখ্য মানবাধিকার লঙ্ঘনের স্মৃতি। আমরা প্রতিরক্ষা খাতে বরাদ্দ কমিয়ে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় খরচ বাড়াতে বলেছি, সরকার শোনেনি; পুলিশ বাহিনীতে সংস্কার করার অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব পড়ে রয়েছে, সরকার বাস্তবায়ন করেনি; আমরা ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টকে নির্বাহী বিভাগ থেকে আলাদা করার কথা বলেছি, সরকার গুরুত্ব দেয়নি; দুর্নীতি কমানোর জন্য ন্যায়পাল আর স্বাধীন কমিশনের সুপারিশ ঝুলে রয়েছে বছরের পর বছর, সরকার আমলে নেয়নি। আইন-শৃঙ্খলার উন্নতিকল্পে আমাদের দাবি আর প্রাপ্তির এতো অসঙ্গতির পরও একটা বিশেষ 'কুলীন' বাহিনীর বদৌলতে হঠাৎ করে পরিস্থিতি সহনশীল হয়ে উঠবে– এটা নিতান্তই আকাশ-কুসুম কল্পনা। অতএব সরকারের কাছে আকুল আবেদন, সন্ত্রাসের যাঁতাকলে ইতোমধ্যেই নিষ্পেষিত জাতিকে অন্তত কুলীন পুলিশের সন্ত্রাস থেকে রেহাই দিন। ▯

আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে মৃত্যু

১ জানুয়ারি ২০০৪ – ১৬ মে ২০০৫

বাহিনী / মৃত্যুর ধরন	র‍্যাব	র‍্যাব ও পুলিশ	পুলিশ	কোবরা চিতা	গণপিটুনি/ আত্মহত্যা	বিডিআর/ সেনা	যৌথ বাহিনী	মোট
'ক্রসফায়ার' (গ্রেফতার ছাড়া)	৩১	২	২৩	৩	-	-	২	৬১
'ক্রসফায়ার' (হেফাজতে)	৫৪	১০	১৩৯	৯	-	-	-	২১২
শারীরিক নির্যাতন (গ্রেফতার ছাড়া)	-	-	৩	-	-	-	-	৩
শারীরিক নির্যাতন (হেফাজতে)	২	-	১৮	-	-	১	৫	২৬
গুলি করে (গ্রেফতার ছাড়া)	৩	১	২০	-	-	৭	২	৩৩
গুলি করে (হেফাজতে)	৯	-	২	-	-	-	১	১২
'গণপিটুনি' (পুলিশ বলেছে)		-	-	-	৫	-	-	৫
হেফাজতে 'আত্মহত্যা' (পুলিশ বলেছে)	-	-	-	-	৩	-	-	৩
মোট	৯৯	১৩	২০৫	১২	৮	৮	১০	৩৫৫

প্রথম আলো, ভোরের কাগজ, সংবাদ, ইত্তেফাক, জনকণ্ঠ, যুগান্তর, ইনকিলাব, দিনকাল, বাংলা বাজার, ডেইলি স্টার, নিউ এইজ ও সংগ্রাম থেকে সংগৃহীত তথ্য অবলম্বনে আসক তথ্য সংরক্ষণ ইউনিট কর্তৃক প্রস্তুতকৃত তালিকা